১০. ভারতে সামন্ততন্ত্র — একটি বিতর্ক

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্তর্বর্তী আদি মধ্যযুগে ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে এক প্রাণবন্ত বিতর্ক রয়েছে। কার্ল মার্ক্স অন্যান্য এশিয় রাষ্ট্রের মতো ভারতের সামাজিক পরিবর্তনহীনতার যে চিত্র এঁকেছেন ভারতীয় ইতিহাসবিদগণ তা মানেন না। দামোদর ধর্মানন্দ কৌশাম্বী ও রামশরণ শর্মার মতো ঐতিহাসিকগণ মার্ক্সবর্ণিত ভারতীয় সমাজের স্থানুত্বের কথা অস্বীকার করে খ্রীঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উন্মেষের কথা বলেছেন ও তার পূর্বেকার সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে চিহ্নিত করেছেন। বি. এন. এস. যাদব ও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঝা'র মতো ঐতিহাসিকগণ কৌশাম্বী-শর্মার ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বটি মেনে নিয়েছিন। অপরদিকে দীনেশচন্দ্র সরকার ও হরবনস মুখিয়া এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও রণবীর চক্রবর্তী এর বিরোধিতা করেছেন। এই বিতর্কে প্রবেশ করার পূর্বে যে বিশেষ আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর (খ্রীঃ ৪৭৩ অব্দ) পশ্চিম ইওরোপে সামন্ততন্ত্রের উন্মেষ ঘটেছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।

খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপীয় ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য সামন্তপ্রথা। অনেকে মনে করেন সামন্তপ্রথার লক্ষণগুলি পশ্চিম ইওরোপে সবচেয়ে প্রকট হলেও এটি ছিল একটি সর্বজনীন ঘটনা, বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলেই বিভিন্ন রূপে যার অস্তিত্ব ছিল, অঞ্চলভেদে যার কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও ছিল। অনেকে আবার মনে করেন প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগে কোনো বিশ্বজনীন ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না। সামন্তব্যবস্থার মূল চরিত্র নিয়েও বিতর্ক আছে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সামন্তব্যবস্থা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ও তার মূল উপকরণ ভূমি। ভূসম্পদ, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপন্ন সামগ্রীর ওপর ভূস্বামীরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ভূস্বামী ও ভূমিদাসের ভেতর আধিপত্য-অধীনতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সামাজিক ধনের উৎপাদন কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক ভোগের জন্যই হতে থাকে। ফলে বাণিজ্যের সংকোচন ঘটে। পণ্য বিনিময়ের সুযোগ কম থাকায় এক আবদ্ধ অর্থনীতির সৃষ্টি হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অঞ্চলভিত্তিক ও পরিবর্তনবিমুখ হয়ে পড়ে। রাজনীতিতেও কেন্দ্রীয় শক্তির পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপর একদল পণ্ডিত মনে করেন সামন্তব্যবস্থা মূলত এক রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা, উৎপাদনভিত্তিক নয়। এই ব্যবস্থা পিরামিডের মতো, যার চূড়ায় থাকেন রাজা।

কিন্তু রাজা তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা শর্তাধীনে সামন্ত বা অভিজাতদের মধ্যে বন্টন করে দেন। সামন্তরাজ যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন এবং প্রয়োজনে পরামর্শও দেবেন। রাজ্যের ভূখণ্ড রাজার কাছ থেকে প্রধান সামন্ত, তার কাছ থেকে মধ্য সামন্ত ও তার কাছ থেকে ক্ষুদ্র সামন্তের মধ্যে বিতড়িত হয়। এই ব্যবস্থায় সামন্তদের আনুগত্য থাকে তার উচ্চতর সামন্তের প্রতি, সার্বভৌম রাজার প্রতি নয়। ফলে সামন্তব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ও আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটতে থাকে।

ভারতীয় মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকগণ আদি মধ্যযুগে রাষ্ট্রকাঠামো ও সাংস্কৃতিক জগতে যে পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয়েছিল তাকে এক নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই দেখেছেন। কৌশাম্বী-শর্মা উভয়েই একমত যে গুপ্তযুগের শেষ দিকে বাণিজ্য ও নগরের অবনতির ফলে ভারতীয় গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতীয় রাজারা তাদের রাজস্ব ও শাসনসংক্রান্ত অধিকার অধীনস্থ সামন্তরাজদের কাছে হস্তান্তরিত করেন। ফলে সামন্তরাজদের সঙ্গে কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। দামোদর ধর্মানন্দ কৌশাম্বী মনে করেন, পরবর্তী পর্যায়ে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে এক ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব হয় যারা স্থানীয় জনসাধারণের ওপর পশুশক্তি প্রয়োগ করত। রামশরণ শর্মা এই দ্বিস্তর মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে এই ব্যবস্থার উন্মেষ খ্রীঃ ৩০০ থেকে ৬০০ সময়সীমায়, খ্রীঃ ৬০০ থেকে ৯০০ অব্দের মধ্যে এই ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ ও খ্রীঃ ৯০০ থেকে ১২০০-র মধ্যে এর চূড়ান্ত পরিণতি ও ভাঙন। শেষ পর্বটিকে রামশরণ শর্মা পুরাণে বর্ণিত কলি যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুসরণে বি. এন. যাদব ও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঝা মনে করেন, অগ্রহার ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান প্রথার মধ্যে দিয়ে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভব। পরবর্তীকালে হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ ও জৈন বিহার এবং আরও পরে যোদ্ধাদেরও ভূমিদান করা হত। সামন্ততন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তিতে গোষ্ঠী মালিকানা হ্রাস পায়। চারণক্ষেত্র, বনভূমি, জলাধার প্রভৃতিও দানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং ইওরোপের মতো ভারতীয় সামন্ততন্ত্রেরও মূল কথা হল অন্তর্বর্তী ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব। এর ফলে কৃষকের স্বাধীনতা হ্রাস পেয়ে সে ক্রমশ দাসে পরিণত হয়। এই যুগে আন্তর্জাতিক সমুদ্র-বাণিজ্য হ্রাস পায়, মুদ্রা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। নগরগুলির জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে নগরজীবনের অবনতি ঘটে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্রমহ্রাসমানতা নগরের অবক্ষয়কে তরান্বিত করে। বৈশালী, কৌশাম্বী ও শ্রাবস্তীর মতো গুরুত্বপূর্ণ নগরের পতন এই সময়েই সূচিত হয়েছিল।

রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামীদের ভারতীয় সামন্তব্যবস্থার ছকটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি সব ক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন, অগ্রহার ব্যবস্থা রাজকীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয় না। তাঁর মতে খ্রীঃ ৬৫০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যেকার অর্থনৈতিক অবস্থা প্রাক্ খ্রীঃ ৬৫০ পর্বের থেকে বিশেষ পৃথক ছিল না। গুপ্তযুগে ভারতের বাণিজ্য হ্রাস পায়নি, মুদ্রার পরিমাণও কমেনি। মুদ্রার যেটুকু অভাব ঘটে তা কড়ি দিয়ে পূরণ করা হয়। তিনি দেখিয়েছেন, ভূমি বা গ্রামদানের কথা বৈদিক সাহিত্যেও আছে। দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন, যাকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বলা হয় তা আসলে চিরাচরিত জমিদারী প্রথা। হরবন্স মুখিয়াও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে আলোচ্য সময়ে ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমিদাসের অস্তিত্ব ছিল না। উৎপাদনের

উপকরণগুলির ওপর কৃষকের পূর্ণ অধিকার বজায় ছিল। ফলে ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যে আধিপত্য- অধীনতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে এই উৎপাদন- ব্যবস্থাকে হরবন্স মুখিয়া সামন্ততন্ত্র আখ্যা দিতে রাজি নন।

রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামীগণ খ্রীঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে যে সামগ্রিক আর্থ- সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র এঁকেছেন তার দুর্বলতাগুলি অনেকটাই চোখে পড়ে। বলা হয়েছে গুপ্তযুগে বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছিল, তাম্রমুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল ও পুরনো নগরগুলি ধ্বংস হয়েছিল। এই পর্যবেক্ষণগুলি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রনবীর চক্রবর্তী দেখিয়েছেন খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দী থেকে রোম-ভারত বাণিজ্য সংকুচিত হলেও ভারতের সঙ্গে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন ও দ্রুত প্রসার সমগ্র এশিয় বাণিজ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দী থেকে আরব বণিকরা পশ্চিম ভারতীয় বন্দরগুলি ছুঁয়ে চীন পর্যন্ত চলে যেত। কীর্তিনারায়ণ চৌধুরীর গবেষণা থেকে জানা যায় আলোচ্য উক্ত দুই বাণিজ্যিক সীমানার মধ্যে পূর্বের মতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া একটি জাহাজের স্থলে একাধিক জাহাজ ব্যবহার করা হত। পশ্চিম উপকূলের ভারতীয় বন্দরগুলিতে এই জাহাজ বদলের কাজটি হত। ফলে আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্যে ভারত অন্তর্বর্তীর ভূমিকা পালন করে। গুজরাট, কোঙ্কন ও মালাবার উপকূল দূরপাল্লার এশিয় বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। পূর্বভারতে সমন্দর বা সুদকাওয়ান অর্থাৎ চট্টগ্রাম অথবা সপ্তগ্রাম আদি মধ্যযুগে প্রধান বন্দর হয়ে ওঠে। তাছাড়া খ্রীঃ দশম ও একাদশ শতাব্দীতে পল্লব ও চোলরাজগণও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় দেশগুলির সঙ্গে সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখেন। অতএব রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামীদের বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের তত্ত্ব মেনে নেওয়া কঠিন।

রণবীর চক্রবর্তীর মতে আদি মধ্যযুগের গ্রন্থ ও লেখমালাগুলিতে 'মন্ডপিকা'র নিয়মিত উল্লেখ আছে। এগুলি হল উত্তর ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র, যার অস্তিত্ব সমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ইঙ্গিত দেয়। দক্ষিণ ভারতে প্রতিটি নাড়ু অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রে 'নগরম' বা অনুরূপ বাণিজ্য কেন্দ্রের উল্লেখ আছে। তাছাড়া এযুগের লেখমালায় শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক প্রভৃতি নামের উল্লেখ এবং নিগম বা সমবায় সঙ্ঘের অস্তিত্ব সজীব অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের নিদর্শন। যদিও রামশরণ শর্মা ও বি. এন. এস. যাদব সাম্প্রতিক গবেষণায় খ্রীঃ ১০০০ অব্দের পর থেকে দ্রুত বাণিজ্যিক প্রসারের কথা বলেছেন, রণবীর চক্রবর্তী এই গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষ্য দিয়েই প্রমাণ করেছেন, খ্রীঃ ১০০০-এর পূর্ববর্তী সময়েও বাণিজ্যের সজীব চিত্রই চোখে পড়ে।

রামশরণ শর্মা আলোচ্য সময়ে মুদ্রা হ্রাসের কথা বললেও ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তা মানেন না। তাঁর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে খ্রীঃ সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে রৌপ্য মুদ্রা নিয়মিত ব্যবহৃত হত যা বাণিজ্যের গতিময়তা প্রমাণ করে। সমকালীন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে পাল-সেন শাসনকালে কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি। তবে কড়ির ব্যবহারের উল্লেখ আছে। কড়ির ব্যবহার আবদ্ধ অর্থনীতির পরিচায়ক নয়, কারণ বাংলাদেশে চালের বিনিময়ে কড়ি আমদানি হত মালদ্বীপ থেকে। তাছাড়া 'চূর্ণী' বা সোনা-রূপার ছোটো ছোটো খণ্ডবিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকায় বণিকরা উপকৃত হত।

রামশরণ শর্মা খ্রীঃ ৬০০ থেকে ১০০০ কালপর্বে নগরের যে সার্বিক অবক্ষয়ের কথা বলেছেন ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় তা মানেন না। পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে তিনি অহিচ্ছত্র, অত্রঞ্জিখেড়া, বারাণসী, চিরান্দ প্রভৃতি নগরের ধারাবাহিক অস্তিত্বের কথা বলেছেন। যে

গাঙ্গেয় উপত্যকায় রামশরণ শর্মা নগর-অবক্ষয়ের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যগুলি সেখানেই নগরের ধারাবাহিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে। গাঙ্গেয় উপত্যকা ছাড়াও গুর্জর-প্রতিহার ও কলচুরি রাজ্যেও নগরের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। খ্রীঃ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ভারতের বেশ কিছু নগর তাদের সমৃদ্ধি হারালেও খ্রীঃ ১০০০ অব্দের পূর্বেই উত্তর ও মধ্যভারতে পূর্ণাঙ্গ নগরের বিকাশও ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন। তিনি একে তৃতীয় দফার নগরায়ন বলে মনে করেন। প্রথম দফা সিন্ধু সভ্যতা হলে, দ্বিতীয় দফা খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ থেকে খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার নগরায়ন যা ক্রমশ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আদি মধ্যযুগের নগরগুলিকে তিনি তৃতীয় দফার নগরায়নের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। এই নগরগুলির অধিকাংশই কোনো বৃহদায়তন শক্তির কেন্দ্র হিসাবে নয়, এগুলির বিকাশ ঘটেছিল স্থানীয় শক্তি ও স্থানীয় বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে।

রামশরণ শর্মা, বি, এন, যাদব ও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঝা'র মতো ঐতিহাসিকদের দাবি অনুসারে ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল কিনা, এ বিতর্কের নিষ্পত্তি হওয়া কঠিন। কারণ সামন্ত ব্যবস্থার কালগত কাঠামো নিয়েই বিতর্ক আছে। রামশরণ শর্মা তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় খ্রীঃ ৩০০ থেকে ১০০০ কালপর্বে নগরের অবক্ষয়ের পেছনে সামন্ততন্ত্রের ভূমিকা দেখলেও তিনি স্বীকার করেছেন, একই সঙ্গে কৃষির ব্যাপক প্রসার পরবর্তীকালে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য ও নগরায়নের পথ প্রশস্ত করে। তাঁর মতে নগরজীবনের সংকোচন ও কৃষির প্রসার পাশাপাশি চলেছিল। কৃষি অর্থনীতির প্রসার বহু স্থানীয় শক্তির উত্থানের পথ সুগম করে। ফলে অর্থনীতির সামগ্রিক অবক্ষয়ের তত্ত্ব রামশরণ শর্মা নিজেও অনেকটা পরিবর্তন করে নিয়েছেন।

অতএব এ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে ইওরোপীয় অর্থে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উন্মেষ ঘটেনি। তবে সামন্ততন্ত্রের কিছু কিছু উপাদান ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। উপাদানগুলির বিকাশ সর্বত্র একসঙ্গে ও একভাবে ঘটেনি। সাধারণ ভাবে সামন্ততন্ত্র এক আবদ্ধ অর্থনীতির জন্ম দিলেও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও নগরায়নের ক্ষেত্রে ভারতের আদি মধ্যযুগ ছিল এক সৃজনশীল পর্ব।